জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

পঞ্চম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

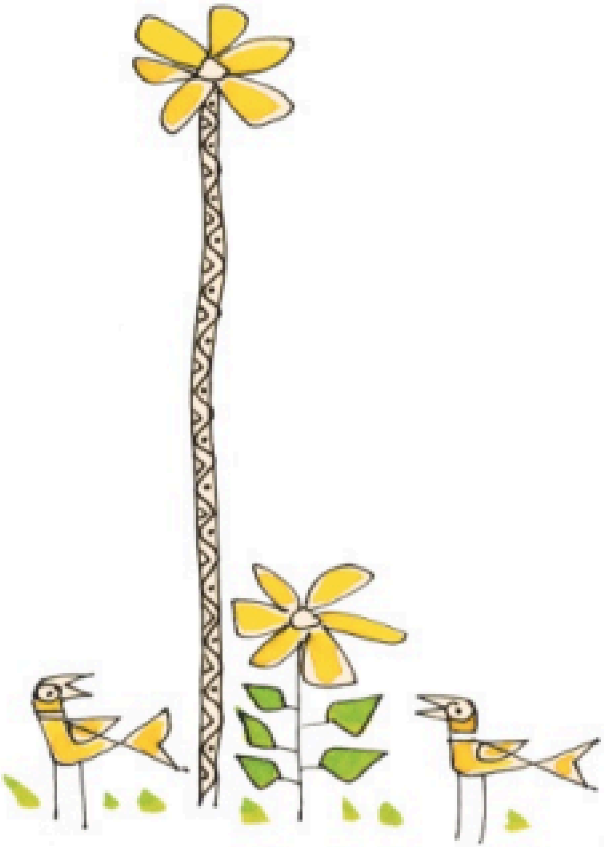

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মাহবুবা নাসরীন
ড. আব্দুল মালেক
ড. ইশানী চক্রবর্তী
ড. সেলিনা আক্তার

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০২৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণে পথে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে প্রাথমিক স্তরে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, মৌলিক চাহিদা, শিশুদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমাজে সকল মানুষের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ, সুনাগরিক হয়ে ওঠার গুণাবলি অর্জন, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ সামাজিক পরিবেশ ও দুর্যোগ, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষক নির্দেশনা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক শিশুদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই বিষয়টির মাধ্যমে মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম ও রাজনৈতিক ভূখণ্ড সম্পর্কিত পাঠ শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক হবে।
- ভূগোল, ইতিহাস ও সমাজ পরিচিতি শিক্ষার্থীদের এ বিষয়গুলোতে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে।
- একই সাথে সামাজিক আচরণ ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য-সংগঠন ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান ও গবেষণা করার দক্ষতা অর্জন করবে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকটির সাথে শিক্ষার্থীরা এখন পরিচিত। কিন্তু তারা এখনও পঠনে সাবলীলতা অর্জন করেনি এবং পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী করতে অভ্যস্ত নয়। তাই পাঠ্যপুস্তকটিকে শিশুদের জীবন উপযোগী করতে শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক। এজন্য বইটির সকল পাঠ ও নির্দেশিত কাজ শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, বয়স উপযোগী এবং ব্যবহারযোগ্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শব্দের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বইয়ের শেষে শব্দভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়

এই পাঠ্যপুস্তকে ১২টি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলোকে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়বস্তুতে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টির জন্য প্রতিটি অধ্যায়ে নির্দিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারিত রয়েছে। এই অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো সামনে রেখেই প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষক সংস্করণে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু

প্রতিটি অধ্যায়কে ২ থেকে ৬টি বিষয়বস্তুতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুতে একটি বিশেষ দিককে নির্দিষ্ট করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুকে দুটি পৃষ্ঠায় বিস্তৃত করা হয়েছে, যেখানে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে বাম দিকের পৃষ্ঠায় এবং নির্ধারিত কাজ ও প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে ডান দিকের পৃষ্ঠায়। এর ফলে শিক্ষক সহজেই পাঠের সাথে শিখন কার্যক্রমকে সমন্বয় করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীরাও সহজেই নির্দেশিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ পাশের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাবে।

পাঠ

প্রত্যেক বিষয়বস্তুর জন্য দুটি করে পাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে মোট ১২টি অধ্যায় শেষ করতে সারা বছরে ৯৬টি পাঠের প্রয়োজন হবে। যেকোনো বিষয়বস্তুর প্রথম পাঠে শিক্ষক সেই বিষয়টির মূল পাঠ্যাংশ বই থেকে পড়াবেন ও বলার কাজ (এসো বলি) করাবেন এবং দ্বিতীয় পাঠে লেখার কাজ (এসো লিখি), সংযোজনের কাজ (আরও কিছু করি) এবং যাচাই (যাচাই করি) এর কাজ করাবেন। শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল দেওয়া আছে। এই শিখনফলগুলো শিক্ষক সংস্করণে

প্রতিটি পাঠের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিটি শিখনফল অর্জন হচ্ছে কি না তা লক্ষ রাখতে পারবেন।

নির্ধারিত কাজ

বইটিতে মূল পাঠ্যাংশের পাশাপাশি প্রশ্ন ও কাজের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এসব কিছুই শিখন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার্থীরা শুধু পড়ে এবং মুখস্থ করার উপর নির্ভর করে শিখতে পারে না। তারা প্রশ্নোত্তর, তথ্য-সংগঠন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে শেখে।
শিক্ষকের জন্য পরামর্শ থাকবে, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পাঠ শুরু করে প্রয়োজনমতো চারপাশের উদাহরণ ব্যবহার করবেন। প্রতিটি বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন ও কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত দক্ষতাগুলোর অনুশীলন ও বিকাশ হবে।

এসো বলি : বলার কাজে নিজস্ব ধারণা প্রকাশ করতে এবং অনেকটা অনানুষ্ঠানিকভাবে এ দক্ষতা অর্জন করতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা হবে। 'এসো বলি'-তে শিক্ষার্থীদের গোটা শ্রেণির কাজে সবার সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হবে এবং শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের উত্তর বোর্ডে লিখে দেওয়া। বোর্ডের লেখা দেখে শিক্ষার্থীরা সঠিক বানান শিখতে পারবে যা তাদের লেখার কাজে সহায়তা করবে।

এসো লিখি : লেখার কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে। যেমন শিক্ষার্থীরা প্রথমে তালিকা তৈরি করবে, এরপর তথ্য বিভাজন ও শ্রেণিকরণের কাজ করবে এবং আরও পরে বাক্য সম্পন্ন করার কাজ করবে।

আরও কিছু করি : এই অংশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর উপর জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পাবে, যেমন- অঙ্কন বা গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের আরও গভীরে যাবে। যদিও 'আরও কিছু করি'র কাজগুলো পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে কিছু সময় বেশি লাগবে, তারপরও এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য স্মরণীয় শিখন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

যাচাই করি : পাঠনিক মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি বিষয়বস্তুর শেষে 'যাচাই করি' দেওয়া হয়েছে। এখানে আছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, এককথায় উত্তর এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন।

শিক্ষার্থীদের কাজে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের দলীয়, জোড়ায় ও একক কাজ সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেবেন, কোন কাজের জন্য কী উপায়ে শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করা হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই বুঝতে পারবে কোন কাজের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে ও দলে ভাগ হতে হবে।

মূল্যায়ন

সর্বোপরি, শব্দভাণ্ডারের আগে শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়নে সহায়তার জন্যে পাঠ্যপুস্তকের শেষে অধ্যায়ভিত্তিক কিছু নমুনা প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে।

সূচিপত্র

১	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন	২
২	ব্রিটিশ শাসন	১০
৩	আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	১৮
৪	আমাদের অর্থনীতি : কৃষি ও শিল্প	৩০
৫	জনসংখ্যা	৪০
৬	জলবায়ু ও দুর্যোগ	৪৮
৭	মানবাধিকার	৫৬
৮	নারী-পুরুষ সমতা	৬৪
৯	আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬৮
১০	গণতান্ত্রিক মনোভাব	৭৬
১১	বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী	৮০
১২	বাংলাদেশ ও বিশ্ব	৯০
•	নমুনা প্রশ্ন	৯৬
•	শব্দভান্ডার	১০০

২০২৫

অধ্যায় ১

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

১ মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর

বাংলাদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন আছে। এই নিদর্শনগুলো থেকে আমরা অতীতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারি।

মহাস্থানগড়

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময়কালের বাংলার ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে এই নিদর্শন। মৌর্য আমলে এই স্থানটি 'পুন্ড্রনগর' নামে পরিচিত ছিল। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত।

এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- চওড়া খাদবিশিষ্ট প্রাচীন দুর্গ
- প্রাচীন ব্রাহ্মী শিলালিপি
- মন্দিরসহ অন্যান্য ধর্মীয় ভগ্নাবশেষ
- পোড়ামাটির ফলক, ভাস্কর্য, ধাতব মুদ্রা, পুঁতি
- ৩.৩৫ মিটার লম্বা 'খোদাই পাথর'

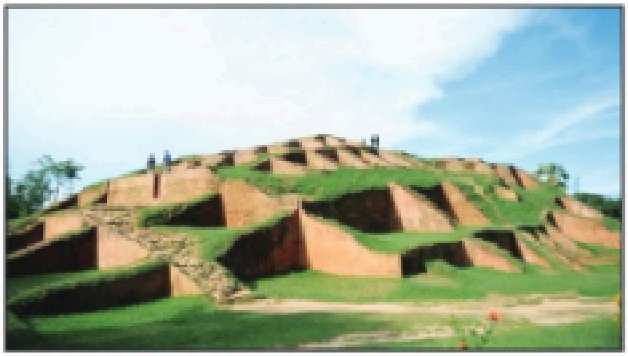
মহাস্থানগড়

উয়ারী-বটেশ্বর

নরসিংদী জেলার উয়ারী ও বটেশ্বর নামক দুইটি গ্রামে প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সভ্যতাটি সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল। প্রাচীন নগরসভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ এখানে প্রাচীন রাস্তাঘাটও পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে রয়েছে ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, হাতিয়ার এবং পাথরের পুঁতি। এসব নিদর্শনের মধ্য দিয়ে আমরা ফেলে আসা সময়কে যেমন জানতে পারি, তেমনি আমাদের ঐতিহ্যকে বর্তমানে ধরে রাখতেও পারি।

উয়ারী-বটেশ্বরের নিদর্শনসমূহ

২০২৫

ক | এসো বলি

প্রাচীন নিদর্শনগুলো রক্ষা করা প্রয়োজন কেন, শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। জাদুঘরে সংরক্ষিত নিদর্শনগুলো থেকে আমরা কী জানতে পারি?

খ | এসো লিখি

পাথরে খোদাই করা দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তির চিত্রটি লক্ষ কর। যারা এটা দেখেনি, তাদের জন্য এটি সম্পর্কে বর্ণনামূলক একটি রচনা লেখ।

গ | আরও কিছু করি

পর্যটকদের জন্য মহাস্থানগড়ের একটি আকর্ষণীয় পোস্টার তৈরি কর। মহাস্থানগড়ের কোন কোন জিনিস মানুষকে আকৃষ্ট করবে?

খোদাই পাথর

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

মহাস্থানগড় খ্রিস্টপূর্ব .... অব্দের কাছাকাছি .... সাম্রাজ্যের ইতিহাস বহন করে।

২ পাহাড়পুর ও ময়নামতি

পাহাড়পুর

এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি ৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দে পাল রাজা ধর্মপালের শাসনামলে নির্মিত হয়। পাহাড়পুর রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। এখানে ২৪ মিটার উঁচু গড় রয়েছে, এটি 'সোমপুর মহাবিহার' নামেও পরিচিত।

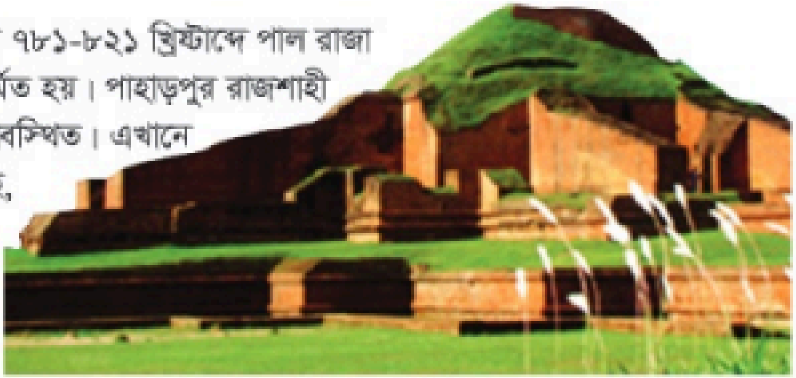

পাহাড়পুর

এই চমৎকার বৌদ্ধ বিহারের চারপাশে ১৭৭টি ভিক্ষুকক্ষ আছে। এছাড়া এখানে মন্দির, রান্নাঘর, খাবার ঘর এবং পাকা নর্দমা আছে। এখানে পাওয়া গেছে জীবজন্তুর প্রতিকৃতি ও টেরাকোটা।

ময়নামতি

ময়নামতি

অষ্টম শতকের রাজা মাণিক চন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির কাহিনি এই জায়গার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কুমিল্লা শহরের কাছে ময়নামতি অবস্থিত।

এটি বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। তবে এখানে হিন্দু ও জৈন ধর্মেরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানকার অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে জীবজন্তু অঙ্কিত পোড়ামাটির ফলক, যেমন: বেজির সঙ্গে যুদ্ধরত গোখরা সাপ, হাতি ইত্যাদি। এখানকার জাদুঘরে বিভিন্ন মুদ্রা ও পাথরের ফলকের নিদর্শনও আছে।

২০২৫

ক | এসো বলি

পাহাড়পুর ও ময়নামতির মধ্যে কোন স্থানটি তোমরা দেখতে যেতে চাও তা একজন সহপাঠীর সাথে আলোচনা কর। স্থানটি দেখতে চাওয়ার কারণগুলো কী কী?
কীভাবে তোমার পরিবারের সদস্যদের এ স্থানটিতে যেতে রাজি করাবে?

খ | এসো লিখি

ছবিতে দেওয়া এই চমৎকার পোড়ামাটির ফলকটি পাহাড়পুরে পাওয়া গেছে। পর্যটকদের উদ্দেশে প্রকাশিত লিফলেটের জন্য ফলকটি সম্পর্কে একটি উপযুক্ত বাক্য তৈরি কর।

গ | আরও কিছু করি

মনে করো, তুমি একজন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং তুমি পাহাড়পুর আবিষ্কার করেছ। সেখানে খনন করার পর তুমি যা যা খুঁজে পেতে পার, সেগুলোর বর্ণনা দাও।

ঘ | যাচাই করি

নিচের নিদর্শনগুলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে পাওয়া গেছে। যে বিষয়টি যে স্থানের, ছকে সে অনুযায়ী লেখ।

উঁচুগড় | বৌদ্ধ ধর্মীয় নিদর্শন | গোপন কুঠুরি
অষ্টম শতক | বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল | বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল

পাহাড়পুর	পাহাড়পুর ও ময়নামতি	ময়নামতি

২০২৫

৩ সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা

সোনারগাঁও

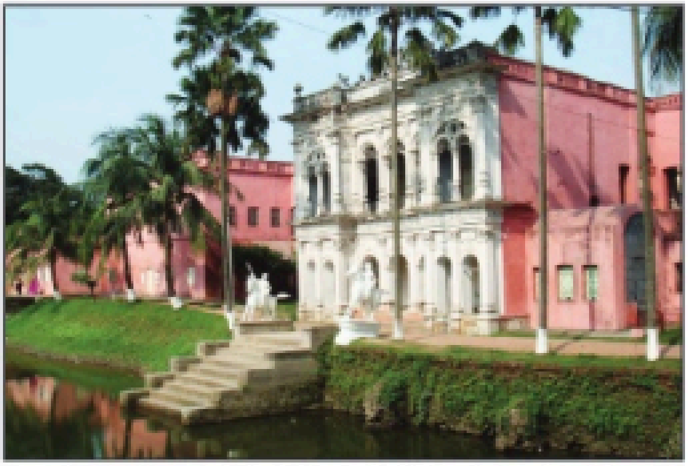
সোনারগাঁও লোক শিল্প জাদুঘর

সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা সতেরো শতকের ঐতিহাসিক নিদর্শন। সোনারগাঁও ঢাকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলায় মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। সোনারগাঁও মধ্যযুগে বাংলার সুলতানদের রাজধানী ছিল। এখনও সেখানে সুলতানি আমলের অনেক সমাধি রয়েছে, যার একটি গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মাজার। ১৬১০ সালে এক যুদ্ধে ঈসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ পরাজিত হওয়ার পর সোনারগাঁও-এর পরিবর্তে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করা হয়। উনিশ শতকে সুতা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে এখানে পানাম নগর গড়ে ওঠে। সোনারগাঁও-এর গৌরব ধরে রাখার জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ১৯৭৫ সালে এখানে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। লোকশিল্প জাদুঘরটি বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র।

লালবাগ কেল্লা

ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ১৬৭৮ সালে লালবাগ কেল্লা নির্মাণ করা হয়। আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযম শাহ্ এই দুর্গটির নির্মাণ কাজ শুরু করলেও শেষ করতে পারেননি। দুর্গটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরি। দুর্গের মাঝখানে খোলা জায়গায় মোগল শাসকগণ তাঁবু টানিয়ে বসবাস করতেন। দুর্গের দক্ষিণে গোপন প্রবেশপথ এবং একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। দুর্গের ভেতরে রয়েছে পরী বিবির মাজার। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

লালবাগ কেল্লা

ক | এসো বলি

মানুষ কেন যুগে যুগে নদীর ধারে গুরুত্বপূর্ণ শহর নির্মাণ করেছে? শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

নিচের স্থানগুলোতে উল্লেখযোগ্য কী কী দেখার আছে সেগুলো লেখ। কাজটি দুজনে মিলে।

স্থান	
সোনারগাঁও	
পানাম নগর	
লালবাগ কেল্লা	

গ | আরও কিছু করি

মাদ্রাসা কিংবা স্কুল থেকে সোনারগাঁও শিক্ষা সফরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখ।

পানাম নগর

ঘ | যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

সোনারগাঁও-এর নির্মাণকাল ....

....

৪ আহসান মঞ্জিল

আহসান মঞ্জিল ছিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে নির্মিত বাংলার নবাবদের রাজপ্রাসাদ। মোগল আমলে জামালপুর পরগনার জমিদার শেখ এনায়েতুল্লাহ্ এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। আঠারো শতকে তাঁর পুত্র শেখ মতিউল্লাহ প্রাসাদটিকে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেন। ১৮৩০ সালে খাজা আলিমুল্লাহ্ ফরাসিদের নিকট থেকে এটিকে ক্রয় করে আবার প্রাসাদে পরিণত করেন। এই প্রাসাদকে কেন্দ্র করে খাজা আব্দুল গণি একটি প্রধান ভবন নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর পুত্র খাজা আহসানউল্লাহর নামানুসারে ভবনটির নামকরণ করেন আহসান মঞ্জিল।

আহসান মঞ্জিল

১৮৮৮ সালের ঘূর্ণিঝড়ে এবং ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে তা মেরামতও করা হয়। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রাসাদটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর এর প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হয়।

এই প্রাসাদে রয়েছে লম্বা বারান্দা, জলসাঘর, দরবার হল এবং রংমহল। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আহসান মঞ্জিল বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

ক | এসো বলি

প্রাচীন স্থাপনাগুলো রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, তারপরও সেগুলো সংরক্ষণ করা উচিত কি না, এ নিয়ে শ্রেণিতে একটি বিতর্ক আয়োজন কর। বিতর্কে দুইটি দল পক্ষে ও বিপক্ষে বলবে। দলের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

খ | এসো লিখি

এই অধ্যায়ে চারটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিক স্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি সময়ের পাশে সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো লেখ। কাজটি দুজনে মিলে কর।

সময়	যা ঘটেছে
খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক	
৮০০ খ্রিষ্টাব্দ	
সতেরো শতক	
উনিশ শতক	

গ | আরও কিছু করি

এই অধ্যায়ে যে চারটি সময় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার ঘটনাপঞ্জি তৈরি কর। প্রতিটি সময়ের উল্লেখযোগ্য স্থান ও নিদর্শনগুলোর ছবি দাও।

ঘ | যাচাই করি

নিচের অংশ পড়ে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলোর নাম লেখ :

ক. মৌর্য আমলে এই স্থানটি 'পুড্রনগর' নামে পরিচিত ছিল ....

খ. এখানে প্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে রয়েছে রৌপ্যমুদ্রা, হাতিয়ার এবং পাথরের পুঁতি ....

গ. এখানকার জাদুঘরে বিভিন্ন মুদ্রা ও পাথর ফলকের নিদর্শনও আছে ....

ঘ. দুর্গের দক্ষিণে গোপন প্রবেশ পথ এবং একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে ....